ফ্যাটি লিভারের ইতিবৃত্ত

সৌমিতা মুখোপাধ্যায়

আজকাল ভারতবর্ষকে 'ডায়াবেটিসের রাজধানী' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। ২০২৫ সালে ৬৯.৯ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে চলেছেন। ২০৩০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৮০ কোটিতে। আমাদের ভেবে দেখার দিন এসেছে। সাধারণ মানুষের জানা নেই ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার, হাইপারটেনশন, কিডনির অসুখ, ক্যানসার এমনকী অ্যালজাইমার—সবই রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অতিরিক্ত গ্লুকোজ ট্রাইগ্লিসারাইডে পরিবর্তিত হয়ে জমছে লিভারে আর সূত্রপাত হচ্ছে 'ফ্যাটি লিভার'-এর।

সবাই ভাবতে শুরু করেছে—বিজ্ঞান তো অনেক এগিয়ে গেছে, তাই যেমন খুশি খাব এবং চলব; ওষুধ তো আছেই। কিন্তু এর ফলস্বরূপ যে জীবন বিষবৎ হয়ে উঠেছে সেটা মানুষ বুঝতে পারছে না। বিশেষত শেষ বয়সের ভয়ংকর দিনগুলিতে—ডায়ালিসিস বা কেমোথেরাপি বা ভেন্টিলেশনকে মানুষ ভবিতব্য বলেই ধরে নিচ্ছে। বয়স্ক মানুষেরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, সুগার বা প্রেসারের ওষুধ তাঁদের আয়ু দীর্ঘ করছে। কিন্তু এই ধারণা চরম ভুল। জীবনের মাঝবয়সে যে ওষুধ আমরা শুরু করি সেই ওষুধই আরও ওষুধকে ডেকে এনে আমাদেরকে 'genetically modified human'-এ পরিণত করছে। আমরা বোকার মতন ঠাকুরের দেওয়া এই দেহকে ফুটিফাটা করে ফেলছি। চারিদিকের প্রলোভনে ভুলে নিজেদের ভাললাগায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছি, তারপর এটা-ওটা ওষুধ খেয়ে মূল কারণকে চাপা দিয়ে ভাবছি সুস্থ আছি। যেটুকু আমি বুঝেছি, তা সকলকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করি, যাতে সকলে সচেতন হয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন।

প্রথমেই আসতে হয় liver health বিষয়ে। আজকাল অনেকেরই ফ্যাটি লিভার আছে। কিন্তু কখনও কি জানার চেষ্টা করেছেন এই ফ্যাটি লিভার এল কোথা থেকে? ১৯৫০ সালের আগে ধরা হত, যারা নিয়মিত মাদক সেবন করে তাদের ফ্যাটি লিভার হয়। আপনার মনে কখনও কি প্রশ্ন এসেছে যে আপনি তো অ্যালকোহল নেন না, ঘনঘন রেস্টুরেন্ট-এর খাবার খান না, তাহলে সাদামাটা খাবার খেয়ে ফ্যাটি লিভার হল কী করে? না, আমরা প্রশ্ন করতেই ভুলে গিয়েছি। ফ্যাটি লিভার সমস্ত 'মেটাবলিক ডিজিজ' অর্থাৎ ডায়াবেটিস, হাইপার-টেনসন, রিউমাটয়েড আর্থরাইটিস, কিডনির অসুখ, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এবং ক্যানসার-এর অন্যতম

পুষ্টি জৈবরসায়ন বিজ্ঞানী। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, দিল্লি।

কারণ। এমনকী থাইরয়েডের সমস্যা, ছোটদের ওবেসিটি, হাই পাওয়ারের চশমা ফ্যাটি লিভার থেকেই সৃষ্ট। তাই আমাদের শপথ নিতে হবে : "food is not for delicacy but as medicine."

ফ্যাটি লিভার দু-ধরনের। অ্যালকোহলিক ও নন অ্যালকোহলিক। যখন পৃথিবীর ইতিহাসে শিশুদের ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সামনে আসে তখনই নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার আবিষ্কার হয় কারণ শিশুরা তো মাদক নেয় না, তাহলে তাদের ফ্যাটি লিভারের উৎস কী! গবেষণায় দেখা গেছে অ্যালকোহলকে লিভার যেভাবে treat করে সেই একইভাবে treat করে গ্লুকোজকে। গ্লুকোজ আছে চকোলেট, ফ্রুটজুস, চিপ্‌স, পিৎজা, পাস্তা ইত্যাদিতে। তাহলে জানা গেল শিশুদের ফ্যাটি লিভারের উৎস। কিন্তু যারা এগুলি সচরাচর খায় না তাদের ফ্যাটি লিভার কী করে হল? একদিন দুদিন প্যাকেট ফুড খেয়ে তো আর লিভার ফ্যাটি হয় না! আসলে মানুষকে বোঝানো হয়েছে—বেঁচে থাকতে গেলে ক্যালরি চাই। কিন্তু কোথা থেকে সেই ক্যালরি নেবে এ-ব্যাপারে মানুষ বিভ্রান্ত। মানুষ জানে ফ্যাট থেকে ক্যালরি নেওয়ার চেষ্টা করলে হার্ট অ্যাটাক আসবে, তাই মানুষ কার্বোহাইড্রেট-এর উপর নির্ভরশীল। কার্বোহাইড্রেট আছে ভাত, রুটি, মুড়ি, চিঁড়ে, সেদ্ধ সবজি—এই সবে। আমরা processed food-এর ওপর নির্ভরশীল। processed food মানে শুধু বিস্কুট নয়; এর মধ্যে ভাত-রুটিও পড়ছে। আজকাল যে-চাল, গম বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি 'genetically modified'। এর মধ্যে ন্যূনতম পুষ্টিগুণ থাকে বা থাকে না কিন্তু খেলে ভরপুর গ্লুকোজ তৈরি হয় রক্তে। রক্তের গ্লুকোজ একধরনের হরমোন নিঃসরণ করে ব্রেনে, যার নাম endorphin। এর ফলে একটা bliss moment-এর সূচনা হয়—ভাত, রুটি, মিষ্টি খাবার খেয়ে মানুষ তৃপ্তি অনুভব করে। endorphin যত ক্ষরিত হবে, মানুষের সেই বস্তুর প্রতি ভাল-লাগা ততই জোরালো হবে। কেউ দুধ-চিনি দেওয়া চা খেতে খুব ভালবাসে, কেউ মুড়ি, কেউ ফুলকো রুটি বা লুচি; আর দুপুরবেলা ভাত খাওয়া তো সবার পছন্দের। তাই দেখা যায় কাউকে staple food বন্ধ করতে বললে অপছন্দ করে বা অবাক হয় যে খিদে পেলে তবে কী খাব! কিন্তু আপনি যখন জেনে যাবেন খিদে পাওয়া, ভাল-লাগার হরমোনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তখন আপনি বদলে যাবেন।

বিজ্ঞান অনেকদিন আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে শরীরে বাইরে থেকে গ্লুকোজ সরবরাহের প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজনে শরীর নিজেই সিনথেসিস করে নিতে পারে। এই পদ্ধতির নাম gluconeogenesis। এই পদ্ধতিতে শরীর প্রয়োজনে ফ্যাট ও প্রোটিন অণু ভেঙে গ্লুকোজ বানিয়ে নেয়। আমরা একে মরুভূমির রাজা উটের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। উট প্রয়োজনে endogenous water বানিয়ে শরীরকে সরবরাহ করে। একই পদ্ধতি আমাদের শরীরেও সম্ভব যখন শরীর ketonebody তৈরিতে সক্ষম হয়।

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে 80 mg থেকে 100 mg ধরা হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই সীমা অতিক্রান্ত হলে শরীর self defence mechanism করে। তাই আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভুল খাওয়া-দাওয়া করেও বেঁচে থাকি, symptoms বুঝতে পারি না। শরীর বারবার জানাতে চায় কিন্তু আমরা অ্যান্টাসিড, পেনকিলার বা কোলেস্টেরল, সুগার, ব্লাড প্রেসারের ওষুধ খেয়ে যেতে থাকি। বোঝার চেষ্টা করি না, শরীরের ভেতরে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। যে-কারণে শরীরকে যুদ্ধ করে blood glucose high করতে হয়েছে বা bp high করতে হয়েছে সেই কারণটা কিছুই না—আমরা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খেয়েছি। ধরা যাক রক্তে 100mg/dl গ্লুকোজ এই মুহূর্তে রয়েছে। 100mg/

ডেসিলিটারকে লিটারে পরিবর্তন করলে হয় 1000mg/লিটার মানে এক লিটার রক্তে 1000 mg গ্লুকোজ বর্তমান। আমাদের শরীরে প্রায় পাঁচ লিটার রক্ত আছে। তাই শরীরে আছে 5000 mg গ্লুকোজ যা 5g অর্থাৎ এক চামচ চিনির সমান। শরীর এই এক চামচ চিনি রক্তে বজায় রাখতে সক্ষম। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমরা শরীরকে এক চামচ চিনির পরিবর্তে অনেক বেশি চিনি (ভাত, আলু, মিষ্টি ইত্যাদি ধরে প্রায় ৫০ চামচ) সরবরাহ করে চলেছি। তার পরিণতি কী হচ্ছে? পরিণতি, অ্যালকোহল না খেয়েও ফ্যাটি লিভার। কীভাবে? প্রশ্ন করলে একটি হরমোনের কথা এসেই যায় যার নাম ইনসুলিন, সর্বজনবিদিত। আপনি যখন যে খাবারই খান না কেন, সেগুলি ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয়। গ্লুকোজ তৈরি হলেই ইনসুলিন বেরিয়ে আসে রক্তে। প্যাংক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন ক্ষরণ হয়। গ্লুকোজ অণু জুড়ে জুড়ে মুক্তোর মালার মতো গ্লাইকোজেন চেন তৈরি হয়ে তা জমা হয় শরীরের বিভিন্ন tissue-তে, ভবিষ্যৎ energy packet হিসাবে। গ্লাইকোজেন তৈরি হওয়ার পরও যখন রক্তে অনেক গ্লুকোজ, শরীর তখন গ্লুকোজ থেকে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে। এই ট্রাইগ্লিসারাইড-কে জমা রাখতে হয় বিভিন্ন অ্যাডিপোজ টিসু-তে (মেদ কলায়)। মেয়েদের শরীরে প্রচুর অ্যাডিপোজ টিসু থাকায় এই ট্রাইগ্লিসারাইডও সহজেই জমা হতে থাকে। আমরা মোটা হতে থাকি। কিন্তু দেখা যায় একই খাবার দীর্ঘদিন ধরে খেয়েও কেউ মোটা হয় আবার কেউ হয় না। যে মোটা হয় না তার ফ্যাট জমা হয় ধমনীর দেওয়ালে সমস্ত রক্তজালিকার মধ্যে, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতরের দেওয়ালে। গবেষণায় দেখা গেছে ছেলেরা হার্টের অসুখে বেশি ভোগে মেয়েদের থেকে। তার কারণ, ছেলেদের শরীরে ফ্যাট জমা রাখার টিসু কম থাকে তাই রক্তজালিকাগুলি সহজেই ব্লক হয়ে যায়। যদি গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন, ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হওয়ার পরেও রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ থেকে যায়, তখন শরীর তৈরি করে বিভিন্নরকম লাইপোপ্রোটিন আর তা থেকে হয় স্টোন ফরমেশন। কিডনি স্টোন, গল ব্লাডার স্টোন ইত্যাদি।

যাই হোক, মানুষ যখন একইরকম ভুল খাবার খেয়েই চলে তখন অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তে ক্ষরিত হয় সেই ভয়ংকর হরমোন যার নাম ইনসুলিন, নামান্তরে গ্রোথ হরমোন। শরীরে বিভিন্নরকম অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি বা growth তৈরি করতে থাকে। শরীরে টিউমার ফরমেশন হতে থাকে, আমরা জানতেও পারি না। এইসব টিউমার কখন যে benign থেকে malignant হয়ে যাবে কেউ কখনও বলতে পারে না। কিন্তু শরীর আমাদের নানাভাবে জানান দিতে থাকে। শরীর একটা full proved robotic system, যার heredityতে যেরকম প্রবণতা আছে, শরীর সেইদিকে মোড় নিতে থাকে। কারও বংশে ডায়াবেটিস বা হার্টের অসুখ থাকলে খাদ্যাভ্যাস সংশোধন করে তা এড়ানো সম্ভব।

যা বলছিলাম। এত কাণ্ডকারখানা যখন শরীরের ভেতর চলতে থাকে, ফ্যাট জমা রাখার জায়গা ফুরিয়ে যেতে থাকে, লিভার তখন নিজেকে আয়তনে বড় করে নেয় আর অতিরিক্ত ফ্যাট জমা করতে সুযোগ দেয়। আপনার ফ্যাটি লিভার হয়ে যায়। এরপর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো—প্যাংক্রিয়াস, কিডনি সব ফ্যাটি হতে থাকে, ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিস অফ লিভার হয়ে যায়। Constipation, heart burn, gastro oesophageal reflux disease (GERD), peptic ulcer এসব হতে থাকে, বারবার UTI (ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন বা মূত্রনালি সংক্রমণ) চলতে থাকে। ত্বকের সমস্যা, অ্যালার্জি পিছু ছাড়ে না। গলব্লাডার কাজ করা বন্ধ করে দেয়। Bile তৈরি হয় না ফলে ফ্যাট আর প্রোটিন হজম হয় না; মলমূত্র দিয়ে ফ্যাট, প্রোটিন

অণু বিভিন্ন আকারে বেরিয়ে যেতে থাকে। শরীর তখন essential aminoacids, fatty acids না পেয়ে মাংসপেশি গলিয়ে nutrients কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। Faulty pathway-তে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়, পায়ের আঙুল বেঁকে যায়। কিডনির ছাঁকনি, glomerular filter ফুটো হয়ে যায়। রক্তে পটাশিয়াম (K^+) হ্রাস পায়, কিডনিতে অতিরিক্ত Na^+ জমতে থাকে, শরীরে অতিরিক্ত Na^+ আয়ন থাকা সত্ত্বেও আপনি ভুল diagnosed হন hyponatremia বলে। এসবই metabolic disorder যা খাওয়া থেকে হয়।

চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক আর হর্মোনাল ট্যাবলেটস খেয়ে ম্যানেজ করা যায় এইসব লক্ষণগুলোকে। কিন্তু তারপরে internal defence mechanism ভেঙে পড়ে আর organ failure শুরু হয়ে যায়। আর একটু বয়স হলে hysterectomy, knee replacement, kidney dialysis।

এখন প্রশ্ন, আপনি কীভাবে জানবেন আপনার ফ্যাটি লিভার হয়েছে? Anthropometry একটি সায়েন্স যেখানে শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ নিয়ে শারীরিক অবস্থার ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করা যায়। এরকমই একটি measurement হল waist circumference and height ratio। আপনি দরজির টেপ নিয়ে নাভির উপর দিয়ে গোল করে কোমরের মাপ নিন এবং ওই মাপকে নিজের height দিয়ে ভাগ করুন। মনে রাখতে হবে দুটি একক একই হতে হবে অর্থাৎ inch/ft/meter/cm. যেকোনও একরকম একক ব্যবহার করতে হবে। WC : H ratio যদি ০.৫৪-এর উপর হয় তাহলে আপনার ফ্যাটি লিভার থাকার সম্ভাবনা আর যদি ০.৭-এর উপর হয় তাহলে আপনার হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা।

আরও নিশ্চিতভাবে জানার জন্য আপনি খালি পেটে USG করলে জানতে পারবেন আপনার লিভারের চিত্র। এ-দুটি পদ্ধতি noninvasive আর blood test তো আছেই। যখন আপনি জেনে গেলেন আপনি ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত, প্রশ্ন আসে এর থেকে নিষ্কৃতি কীভাবে পাওয়া যাবে। আগে মনে করা হত অতিরিক্ত ফ্যাট খেলে তবেই ফ্যাটি লিভার হয়, তেল-মশলা খেলে হয়। কিন্তু ১৯৫০ সালেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, স্যাচুরেটেড ফ্যাট কখনও ট্রাইগ্লিসারাইডে রূপান্তরিত হতে পারে না। স্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকে তৈরি হয় শরীরের প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন fat soluble vitamins, hormones, neurotransmitteres ইত্যাদি। স্যাচুরেটেড ফ্যাট না খেলে সেগুলি আমাদের শরীরে তৈরি হতে পারে না আর নানারকম অসুখ তৈরি হয়।

যাই হোক, ফ্যাটের বিভিন্ন নাম আছে : ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল, ট্র্যান্সফ্যাট ইত্যাদি। রক্তে ফ্যাটের যে-রূপটি সব থেকে বেশি মাত্রায় জমতে দেখা যায় সেটি ট্রাইগ্লিসারাইড যা কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয় এবং লিভারে গিয়ে জমা হতে থাকে। কাজেই বুঝতে পারছেন আপনি যখনই কার্বোহাইড্রেট খাওয়া বন্ধ করবেন, শরীর তখনই আপনার জমা ফ্যাট থেকে gluconeogenesis করে গ্লুকোজ তৈরি করে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করবে। আপনার ওজন কমবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, যারা মোটা তাদের না হয় ওজন কমল কিন্তু যারা রোগা তাদের কী হবে? তাদের অনেকেই তো ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত! তাদের মাংসপেশিকে রক্ষা করতে বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের প্রোটিন, ফ্যাট দিতে হবে—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন, নারকেল তেল ইত্যাদি। ফ্যাট আমাদের শরীরে দুভাবে জমা থাকে। এক, visceral fat যা body cavity-তে internal organ-এর মধ্যে; দুই, subcutaneous fat যা স্কিনের নিচে পেশির সঙ্গে জুড়ে থাকে। শরীর

একটি intelligent system। কার্বোহাইড্রেট খাওয়া বন্ধ করলে প্রথমে visceral fat burn হয় তারপর subcutaneous fat। যেমন আমরা ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাতে প্রথমে নিশ্চয়ই দামি আসবাবপত্র জ্বালাই না, খারাপ কাঠ জ্বালাই, সেরকমই শরীর প্রথমে visceral fat burn করে। একমাসের মধ্যে ওজন কমতে শুরু করবে ব্যায়াম ছাড়াই। লিভারের ফ্যাট ঝরানোর এটিই একমাত্র পথ।

এখন, কার্বোহাইড্রেট আমাদের খাবারের ৮০ শতাংশ আর ফ্যাট মাত্র ২০ শতাংশ। ঠিক উলটোটা হতে হবে। তাহলে কী খাবেন? এমন খাবার খেতে হবে যা আপনাকে দীর্ঘক্ষণ খিদে না পাওয়ার অনুভূতি দেবে। তাহলে খিদে কীভাবে পায় আপনাকে সংক্ষেপে জানতে হবে। Stomach pH সামান্য alkaline হলে vagus nerve-এ sensation হয় তখন stomach cells থেকে ghrelin হরমোন নিঃসৃত হয় আর আপনার খিদে পেয়ে যায়। দেখা গেছে যে-সমস্ত খাবারের glycemic index কম সেগুলি খেলে সহজে গ্লুকোজ তৈরি হয় না। আধুনিক গবেষণা বলছে insulin index যেসমস্ত খাবারে কম সেইরকম খাবার খেতে হবে। glycemic index হল খাবার খাওয়া ও গ্লুকোজ তৈরি হওয়ার মধ্যেকার সূচক। যেমন ধরা যাক ভাত ও আলু। ভাতের glycemic index আলুর থেকে বেশি তাই মানুষকে এই দুটির মধ্যে বেছে নিতে হলে আলুকে বেছে নিতে হবে। আবার insulin index-এর অর্থ হল যা insulin secrete করে কত তাড়াতাড়ি তা বোঝায়।

দেখা গেছে যে-খাবার খেয়ে সহজে ইনসুলিন ক্ষরণ হয় না, তা হজম হতে সময় লাগে এবং সহজে খিদে পায় না। আবার শরীরে assimilationও অনেক সহজে হয়। যা খেলে ইনসুলিন যত কম ক্ষরণ হয়—Noncarbohydrate food—সেই জাতীয় খাবার তত তাড়াতাড়ি ফ্যাটি লিভার সারাতে সাহায্য করে। যেমন ডিমের insulin index, readymade protein powder-এর থেকে অনেক কম তাই দামি readymade protein powder-এর পরিবর্তে ডিম, ক্রিম দুধ খান। অনবরত antacid, antiflammatory ব্যবহার করার ফলে হজমশক্তি সবারই গত হয়েছে। আবার অনেকেরই গলব্লাডার বাদ গেছে অর্থাৎ bile নেই।

আগেই বলেছি আমাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ভগবানপ্রদত্ত। শরীর কখনই সেই মাত্রার পরিবর্তন ঘটাতে দিতে চায় না। রক্তে দীর্ঘদিন গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়তে থাকলে রক্তের ঘনত্বের পরিবর্তন হয়। এক ইউনিট এরিয়ার ওপর ধমনীর দেওয়ালে ব্লাড যে-প্রেসার দেয় সেটাই ব্লাডপ্রেসার। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়লে রক্তের flow rate কমে যায়, স্বাভাবিকভাবেই bp বাড়তে থাকে। রক্তের পরিবহন ক্ষমতা কমে যায়, ফলে শরীরে যে-সমস্ত অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যপদার্থ তৈরি হয় তা লিভারে গিয়ে জমা হতে থাকে। শরীরে পরিমাণমতো bile নিঃসরণ না হলে ওইসব toxin দ্রবীভূত ও metabolized ও শরীরের বাইরে নির্গত হতে পারে না। তাই লিভার ভাল রাখতে প্রথম কাজ করতে হবে—গলব্লাডারকে ঠিকমতো কাজ করানো। এজন্য আপনাকে stomach pH acidic রাখতে হবে। এ-ব্যাপারে পাতিলেবুর রস অতুলনীয়। পাতিলেবু একটি বিশদে আলোচনা করার বিষয়বস্তু। দু-তিন চামচ জলে গোটা পাতিলেবু রস করে খেয়ে ফেলতে হবে। টক লেগে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই লেবুর রস খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করে নেওয়া ভাল বা স্ট্র ব্যবহার করে খাওয়া ভাল। লেবু stomach pH কম রাখতে সাহায্য করবে আর গলব্লাডারের সংকোচন-প্রসারণ করে bile নিঃসরণ হতে সাহায্য করবে। যাঁদের পেপটিক আলসার আছে তাঁরা অবশ্যই dilute করে খাবেন। Apple cider vinegar (acv) liver cleansing

agent হিসাবে কাজ করে। দিনে দু-তিনবার এক গ্লাস জলে এক চামচ acv মিশিয়ে খেলে আপনার লিভার হেল্‌থ ভাল হবে। ইনসুলিনকে কমিয়ে রাখতে acv খুবই কার্যকরী, তাই acv নিয়মিত খেলে আপনার শরীরে টিউমার ফরমেশন নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। দীর্ঘদিন খাবারে ফ্যাট ও প্রোটিন কম থাকলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডস প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় আর ধীরে ধীরে metabolic disaster হয়ে যায়। যখনই কোনও খাবার খাবেন তাতে ফ্যাট যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে—যেমন ঘি, মাখন বা অলিভ অয়েল। ফ্যাট হজম করতে সমস্যা হলে কিছু সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে যেমন TUDCA। এটি একটি bile acid component যার পুরো নাম Tauroursodeoxycholic acid। আগে ভালুকের শরীর থেকে বানানো হত এখন মিল্ক থিসল নামক উদ্ভিদ থেকে বানানো হয়। এটি ফ্যাট জাতীয়, খাবার হজম করাতে ভীষণ কার্যকরী কিন্তু ভুলেও কখনও অ্যান্টি অ্যাসিড নয়। অ্যাসিডের অ্যান্টি যে, সে stomach pH acidic রাখতে দেয় না। দিনে প্রথমে তিনবার তারপর দুবার খাওয়া অভ্যাস করতে হবে। এই ধরনের ফ্যাট ও ন্যাচারাল প্রোটিন খেলে বারবার খিদে পাওয়া আর থাকবে না। দুটি খাওয়ার মধ্যে চার ঘণ্টা ও রাতের খাওয়ার পর সকালে খাওয়ার মধ্যে অন্তত চোদ্দো থেকে ষোলো ঘণ্টার ব্যবধান থাকতে হবে। মাঝে খিদের অনুভূতি থাকলে গ্রিন টি, ব্ল্যাক কফি, লেবুজল খাওয়া যেতে পারে। শুরুতে কঠিন মনে হলেও চার-পাঁচ কেজি ওজন কমার পর খুবই সহজ মনে হবে। পনেরো দিনে একবার অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস রাখা প্রয়োজন। কিন্তু যা খাচ্ছেন সেটি উচ্চ গুণসম্পন্ন হতে হবে। তাতে কোনও সিড অয়েল, সরষের তেল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, ক্যানোলা অয়েল, গ্রাউণ্ড নাট অয়েল, রাইসব্র্যান অয়েল, সিসেম অয়েল ইত্যাদি থাকা চলবে না। ভাত-রুটির বদলে যেকোনও সেদ্ধ ডাল খাওয়া যেতে পারে কারণ ডালে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ খুব সামান্য থাকে আর ইনসুলিন ইনডেক্স কম থাকে। মিষ্টি জাতীয় ফল সাময়িক বন্ধ করতে হবে যেমন কলা, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি। নারকেল অতি পুষ্টিকর ফল, যার ইনসুলিন ইনডেক্স কম থাকে ও ফ্যাটের পরিমাণ লক্ষণীয় মাত্রায় থাকে। প্রচুর পরিমাণে সবুজ সবজি কার্বোহাইড্রেট হিসাবে খেতে পারেন কিন্তু তাতে তেল থাকা চলবে না। আজকাল ওটস এবং কর্নফ্লেকস-এর খুব চল হয়েছে যার ইনসুলিন ইনডেক্স খুবই বেশি। মশলা সবই থাকতে পারে। রান্নার শেষে ঘি বা মাখন ব্যবহার করা শিখতে হবে। ঘি বা মাখনকে আগুনে ব্যবহার করে ফোড়ন দেওয়া চলবে না। সাময়িক ভিটামিন D3 Codliver oil, potassium & magnesium citrate supplement নিতে হবে। K & Mg electrolyte হিসাবে কাজ করে। এক মলিকিউল গ্লাইকোজেন জমা হওয়ার জন্য তিন মলিকিউল জল ও এক মলিকিউল K লাগে। তাই যখন আপনার শরীরে জমা ফ্যাট বেরিয়ে যাবে তখন ভিটামিন ও ইলেকট্রোলাইটসও বেরিয়ে যাবে। সেজন্য শুরুতে সাপ্লিমেন্ট নেওয়াটা জরুরি, পরে সঠিক খাবারের মাধ্যমে শরীর নিজেই secrete করতে পারবে। এভাবে চললে ছমাসে সহজেই লিভার ফ্যাট ঝরিয়ে ফেলা যাবে।

যে-শরীর ঠাকুর আমাদেরকে দিয়েছেন ইচ্ছামতো ব্যবহার করে আমরা তার ক্ষতি করতে পারি না। কিন্তু দাবার বোর্ডে যখন অর্ধেক খেলা হয়ে গেছে তখন আমরা হাল ধরেছি। অনেক শক্তি হারিয়ে গেছে—কারও ইউটেরাস নেই, কারও গলব্লাডার নেই, কারও পেসমেকার বসেছে ইত্যাদি। কিন্তু প্রবাদ তো আছেই—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তাই খাওয়া-দাওয়ার রুটিন পরিবর্তন করে সুস্থ থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।